বাংলা গান ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মানসী ভট্টাচার্য

যে কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙালির আত্মসম্প্রসারণের যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির নবজাগ্রত চৈতন্য জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অচলায়তন ভেঙে ফেলে এক সৃষ্টিশীল জীবনস্রোত বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দরজা আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। তারই সংস্পর্শে এসে ঘটেছে এ দেশে নবজাগরণ। এই প্রস্ফুটিত নবজাগরণের ধারক ও বাহক হিসেবে আমরা পেয়েছি তেমন ক'য়েকজন মনীষী, যাঁরা সাহিত্যে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় এনেছিলেন যুগান্তকারী চিন্তা ভাবনা। অন্ধকুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে মানুষ প্রথম দেখতে পেয়েছিল মুক্তির আলো, ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বরূপ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে আমরা পেয়েছি এই নবজাগরণেরই অন্যতম একজন পথিকৃৎ রূপে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও সর্বোপরি গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সঙ্গীতেও ছিলেন তেমনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে আধুনিকতার জনক। হিন্দুস্থানী রাগরাগিনীর দুর্বোধ্যতা থেকে বাংলা গানকে মুক্ত করে তাকে সর্বসাধারণের আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গীতিকার ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের অনুসারী হয়েও নিজস্ব ভঙ্গীতে গান রচনা করেছেন, যা তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্টে দীপ্যমান শুধু নয়, বাংলা গানের ভান্ডারকে রূপে রসে সমৃদ্ধ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনা সম্ভারের প্রাণ স্বরূপ তাঁর গান। বিভিন্ন আঙ্গিকের গান তিনি রচনা করেছেন। প্রকৃতি ও প্রেমের গান, নাটকের গান এবং সর্বোপরি স্বদেশ চেতনার গান যা জাতীয় জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং আজও তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (১২৭০, ৪ শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত, সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক, তেজস্বী ও বলিষ্ঠ চরিত্র পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তৎকালে কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক জগতে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর বাসভবনে সমবেত হতেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন মার্গ সঙ্গীতে বিশারদ। সঙ্গীত সরস্বতীর বরপুত্র দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতপ্রিয় হৃদয় পিতৃদেবের সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে স্বর্গ সুখ অনুভব করত। এদেশে ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ব করতে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। সেখানেই ঘটে তাঁর ইংরেজি গানের সঙ্গে পরিচয় এবং এ পরিচয় রূপান্তরিত হয় প্রেমে। বিলেতি গান দ্বিজেন্দ্রলাল আয়ত্ব করেন আন্তরিকতা নিয়ে, একই সঙ্গে আইরিশ ও স্কচ্ গানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী রাগরাগিনী এবং বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি ও তার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের। প্রাচ্য -পাশ্চাত্য সুর-সরস্বতীর এই অপূর্ব সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা গান সঙ্গীত জগতে এক অভিনবত্বের সূচনা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রাগরাগিনীকে সমন্বিত করার প্রথম প্রয়াস আমরা দেখি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মধ্যে। তাঁর সময় থেকেই আমাদের দেশের সঙ্গীতে বিলেতি বাদ্যচর্চার প্রচলন হয়। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থকভাবে বিলেতি সুরকে দেশীয় সঙ্গীতে জনরিয় করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র সঙ্গীত রচনায় স্বদেশ চেতনার গান এবং হাসির গান এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বারো থেকে সতেরো বছর বয়সে লেখা 'আর্যগাথা'র প্রথম ভাগে কবি লিখেছেন– '...যদি কেহ শোক-জরা সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখনও নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহারও অধঃপতিতা দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখনও সিক্ত হইয়া থাকে, আর্যগাথা তাহারই আদর চাহে, আদর পায় আবার নূতন গীত শুনাইব।' স্বদেশ মন্ত্রে বাণী সহ দ্বিজেন্দ্রলাল কিশোর বয়সে 'আর্যগাথা'র প্রথম ভাগে মাতৃভূমির ছবি এঁকেছেন 'মনোমোহন মুরতি' মলিন বীণার ঝঙ্কার নীরব, নয়নে অশ্রু।

'...লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আমার।'

খুব সহজেই বোঝা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশানুভূতি নিতান্ত শৈশব বয়স থেকে এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়। বিলাত প্রবাসকালে প্রকাশিত Lyrics of Ind কবিতায় স্নেহ ভক্তির আবেগ বিগলিত অন্তরে অধঃপতিতা ভারতমাতাকে আমার দেশ (My land) সম্বোধন করে লিখেছিলেন–

O my land! Can I cease to adore thee...
O dear Bharat My beautiful maiden
O sweet Ind! once the queen of world.

বাল্য ও যৌবনের এই স্বদেশপ্রীতি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে পরিপুষ্টি লাভ করে দেশপ্রাণতার অমৃত রসে তাঁকে আমরণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখেছিল।

বিলেত গিয়ে বলিষ্ঠ ইংরেজ জাতির বলিষ্ঠ সভ্যতার নানাগুণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাই বলিষ্ঠ জাতির ছন্দ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রথম যৌবনের আশাশীল মনে এ উৎফুল্ল প্রত্যয় ঠাঁই পেয়েছিল যে ইংরেজ ভারতকে শ্রেষ্ঠা করে চাইবে 'ভাববাণিজ্য'। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি দেখলেন যে ইংরেজ ভারতীয় সংস্কৃতিকে ও ভাবধারাকে রীতিমতো অবজ্ঞা করে। সম্পর্কটা এক কথায় প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। তিনি কষ্ট পেতেন আমাদের এই জাতীয় ভীরুতার কথা ভেবে। অত্যধিক সম্পর্কতার মানুষটি যেখানেই আত্মগ্লানির ছায়া দেখতেন

সেখানেই তাঁর সমগ্র মনটি জ্বলে উঠত শুধু গ্লানিতে নয়, সমবেদনায়। আর সেই সঙ্গে উহ্য হয়ে আছে এই বাণী যে এ হেন সন্তানের সাজে না ক্লৈব্য, এ হেন মায়ের সন্তানকে হতে হবে স্বাধীন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত। গভীর বেদনা বোধ করতেন দেশবাসীর মনে-প্রাণে অসাড়তা– স্বাধীন চিন্তার দৈন্যে–সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। বিদ্রূপেও তাঁর সেই সব হাসির গান বা ব্যঙ্গচিত্রই সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, যে সব গান বা ছবিতে নিবিড় হয়ে আছে কবি হৃদয়ের গভীর ব্যথা–দেশাত্মবোধ–আত্মধিক্কার। দেশের মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তাই তাদের সর্ববিধ অপমান, হীনতা, চিত্তদৈন্যকে তিনি গায়ে পেতে নিয়েছিলেন নিজের গ্লানি বলে। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ হাসির গান হাসি হতে পেরেছিল 'Laughter Veiled in tears' তাই তাঁর ব্যঙ্গ সঙ্গীতগুলিও এক ধরনের স্বদেশ প্রেমেরই গান। এগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। নিজে বিলেত ফেরতা হয়ে বিলেতি কদাচারকে ব্যঙ্গ করা যথেষ্ট সৎ সাহসের পরিচায়ক। এগুলি তাই মূল স্বদেশি গানগুলির চেয়েও অধিকতর জাতীয়তার উদ্দীপক। যেমন–

'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার, স্বদেশি আচার
করিয়াছি সব জবাই

তিনি বুঝেছিলেন কেবল মিটিং ও বক্তৃতা করে দেশোদ্ধার করা সম্ভব নয়, তিনি দেশবাসীকে পথ দেখাতে চেয়েছিলেন অন্যভাবে। বক্তৃতা সর্বস্ব জাতির অপদার্থতাকে তিনি বিদ্রূপ করে গাইতেন–

'আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের বেলায় টুঁ টুঁ।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র বাঙালি জাতিকে উদ্দীপিত করেছিল জাতীয় ভাব উদ্দীপনায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা গীতি সাহিত্যের যদি কোনও অবদান থাকে তবে তার বেশি ভাগ কীর্তির শিরোপা প্রাপ্য দ্বিজেন্দ্রলালের যিনি অসাধারণ কিছু স্বদেশ চেতনার গান রচনা করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক অখ্যাতনামা গ্রাম্য কবিরাও স্বদেশি গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু দেশকে অবলম্বন করে এক উচ্চতর ভাবলোক সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আর কোনও কবির রচনায় তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের গানগুলি এক অভিনব উৎকণ্ঠায় বিধুর। দেশপ্রেমকে তিনি এক নতুন অর্থে মন্ডিত করে তুলেছিলেন দেশমাতৃকার মূর্তিটি মানবীয় রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। মৃন্ময়ীকে তিনি চিন্ময়ী করে তুলেছেন–

'জননী তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার
অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার
বিতর মুক্তি
জননী, তোমরা সন্তান তরে কত না বেদনা
কত না হর্ষ
জগৎপালিনী জগত্তারিনি, জগজ্জননি
ভারতবর্ষ।

প্রাচীনকালে চারণ কবিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জাতীয় গৌরব ও মহিমার গুণগান প্রচার করে বেড়াত। দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের গানে এই চারণব্রত বাণীরূপ লাভ করেছে। এ সকল গানের সুর তিনি বিদেশের সামরিক সঙ্গীত থেকে আহরণ করেছিলেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক এষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ গানের বাণী যেমন ওজঃগুণ সমৃদ্ধ, তেমনি সুরের বাঁধুনিতেও রয়েছে বলিষ্ঠতা ও বীর্যব্যঞ্জকতা। এই গানগুলির সুর থেকে একটা সংগ্রামিক চেতনা স্বতঃই ঝরে পড়ছে। এ গানে উচ্চকণ্ঠে গীত সমবেত কোরাস বিদেশি সঙ্গীত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা গানে যা সম্পূর্ণ নূতন। তেমনি গান–

'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে
ভারতমাতা।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত অন্যতম মহাসঙ্গীত
'আমার জন্মভূমি'–

'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

কোমলপ্রাণা বাঙালি মনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মধুর কোমলতায় ভরা এ মাতৃবন্ধনা সারা বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল বাংলার ঘরে ঘরে মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল। বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন–

'ধন্যধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

ইহা একটি মহান সঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে নিজের ধ্যান আছে...এই গানকে ইংরেজিতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে, আমাদের দেশমাতাকে পরের মা বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই গানকে রুশিভায় তর্জমা কর, যদি তাহা এমন সুন্দর ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদি হয়, তাহা হইলে রুশিয়ানরও এই নাম সংকীর্তনে বিগলিত প্রাণে যোগদান করিবে। কবির কাব্যের এমনি শক্তি– তাহার সার্বভৌমিকতা এমনি অপূর্ব।' জাতির ভীরুতা, কাপুরুষতা, নানাবিধ দুর্বলতায় কবি আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন, কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়, আশাবাদী কবিকণ্ঠ এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্যতম মহাসঙ্গীত 'আমার দেশ' -এ–

'যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত মেষ
দেবি আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!'

কথা ও সুর এই দু'য়ের সংমিশ্রণে রচিত হয় কাব্যসঙ্গীত। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের প্রেমসঙ্গীতগুলিতে কাব্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব মাল্যবন্ধন হয়েছে। 'কী দিয়ে সাজাব মুরতি', 'মোর হৃদয়ের আলো তুই রে সতত', 'তোর কী মোহ কুহক এ খেলায়', 'আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে', 'এ জীবনে পুরিল না সাধ' প্রভৃতি গানগুলি থেকে তাঁর তরুণ বয়সের সুরকার-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে একটি ঘুম পাড়ানি গান 'আয় রে আমার সুধার কণা' বাংলা কাব্য সঙ্গীতের ইতিহাসে এক নূতন সৃষ্টি। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের 'আর একবার ভালোবাসা বাসতে যেন আগের দিন'। কাব্যসঙ্গীতের গাতিলাবণ্যে অপূর্ব সুর ও বাণীর যুগল রসে গানকে কতখানি সমৃদ্ধ করে তোলা যায় তার আর একটি উদাহরণ 'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি'। ভৈরবী রাগের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিপুণ কথা বিন্যাস ও ভাব গভীরতায় গানটি সমৃদ্ধ।

প্রকৃতি -প্রেমমূলক গানগুলি প্রকৃতি বর্ণনা মাত্র নয়। এগুলিতে মানব হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সংযোগের কথাই আছে। প্রকৃতি কবির হৃদয়ে প্রভাব সঞ্চার করেছে সে কথা বলাই হয়েছে। কবি নিজের মনোভাবে প্রকৃতিকে অতিরঞ্জিত, আবিষ্ট ও চিত্রিত করেছেন। যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ সংযোগ চিত্ররসকে ফুটিয়ে তুলেছে। এও দ্বিজেন্দ্রলালের এক নতুন ভঙ্গি–

'একি জ্যোৎস্না গর্বিত শর্বরী
একি পাণ্ডুর তারা গুঞ্জ
একি সুন্দর নীরব মেদিনী
একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ।'

অনুপ্রাসের গুঞ্জন দ্বারা প্রকৃতির একটি উল্লাসময় ছবি এঁকেছেন যা চমৎকারিত্বের অভিনব–

'একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ
পবন মন মন্থর
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ
পত্রকুঞ্জ মর্মর।'

কাব্যসঙ্গীত কেবল কণ্ঠবাদন নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাব্য সৌন্দর্য ও কথা রস সৃষ্টির লাবণ্য। 'নীল আকাশের অসীম ছেড়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো', 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে।' প্রভৃতি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীতের সুরবিহারী অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। সুর বিহঙ্গ অসীম ভাবের বিস্তীর্ণ আকাশে তার সপ্ত পক্ষ বিস্তার করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমলীলা বৈচিত্রের যতগুলি প্রকরণ আছে সেই সব প্রকরণের সঙ্গে কবির পদগুলির সম্বন্ধ আছে। প্রেমের আকুতি, আকিঞ্চন, আকুলতা ও গহনতায় এই গানগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। প্রেমের নৈরাশ্যমূলক গানগুলি পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের পদগুলিকে স্মরণ করায়।

'যাও হে সুখ পাও সেখানে সেই ঠাঁই,
আমার এ দুখ আমি দিতে ত পারি না।'

তেমনি একটি গান। গভীরতা আনন্দে, শুভ্রতার স্বপ্ন, উজ্জ্বলতার উদ্ভাস কবির প্রেমের গানের পেছনে আলো ধরেছে, তেমনি একটি গান–

'তোমারেই ভালোবেসেছি আমি
তোমারেই ভালোবাসিব
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।'

এ প্রেম আরও উচ্চসঞ্চারী হয়েছে তাঁর প্রেমতন্ময়তার গানে–

‘তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর,
তুমি হে আমার প্রাণ।
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার
সকলই তোমারই দান।’

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় কোন তন্ময়তার চেতনা থেকে এ গানের প্রেরণার ঢল নেমেছে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন–

‘এ গান শুধু প্রণয়ী নয়– সাধকের মুখেও সাজে।

কারণ এর মূল প্রেরণাটি আধ্যাত্মিক।...কবির নানা প্রেমের গানেই আমরা পাই এ বৈষ্ণবভাব...। এ তিনি পেয়েছিলেন কারণ তিনি স্বধর্মে ছিলেন ভক্ত, প্রেমী।’ শেষ জীবনে ক্রমশঃ তিনি ভাবগভীরতা তথা আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছেছিলেন। গানের দিক দিয়ে এসেছিল এক মহত্তম সাঙ্গীতিক বিকাশ। তাই তাঁর ভক্তির গানে যে শ্রেণির আশ্চর্য ভাবগাঢ়তা ও ‘তৎসুখসুখিত্বের’ ভাব ফুটে উঠল তার কাছে মানবিক প্রেমের গানও নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

‘ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়
এ কে, নেচে নেচে চলে
মুখে ‘হরি’ বলে
ঢলে ঢলে পাগলেরি প্রায়।’

গানে প্রেম বিহ্বল তরুণ সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের যে মুর্তি ফুটে উঠেছে সে মূর্তি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কারোর কোনও গানেই সম্ভবত ফোটেনি। সহজ সরল অথচ কবিত্বময় ভাষায় মাতৃভক্ত কবির শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যেও এক ভক্তি ব্যাকুল নির্ভরতার সুর লীলায়িত হয়েছে।

‘চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপনভাবে বিভোর শ্যামা।’

মান-অভিমান, আদর-আবদার, কামনা-বাসনায় জর্জরিত হয়ে দিশাহারা সন্তান মায়ের শরণ নেয় আর কাতর হয়ে বলে–

‘আয় মা এখন তারারূপে স্থিতমুখে শুভ্রবাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে
এতদিন তো কালী ভীমা তোরি পূজা করেছি মা
পূজা আমার সাঙ্গ হল– এখন মা তোর অসি নামা।’

ইউরোপীয় ভাবধারায় দীক্ষিত মানুষটি এভাবেই পরিণত বয়সে রচনা করেছেন ভক্তিসঙ্গীত যা বাংলার ভক্তিসঙ্গীতে এক নতুন সংযোজন, একান্ত নিজস্ব সম্পদ। শেষ জীবনে যখন তিনি গঙ্গাস্তোত্রটি রচনা করে গাইতেন–

‘পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে’

বুঝতে অসুবিধা হত না যে, এ প্রার্থনা যুক্তিবাদীর নয়, এ প্রার্থনা প্রকৃত ভক্তের।

গীতিকার হিসেবে বাংলা সঙ্গীত জগতে দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক বিশেষ অবদান তাঁর নাটকের গান। নাটকের প্রয়োজন হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসঙ্গীত এক স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী। নাটকের একটানা ঘটনার মধ্যে খানিকটা আনন্দময় বিরতি বা dramatic relief–এর জন্য কিছু গান কবি ব্যবহার করেছেন। সার্থক নাট্যসঙ্গীত নাটকীয় তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। কবির রচিত ও ব্যবহৃত গানগুলি নাটকের চরিত্র বিকাশে সহায়তা করেছে, অনেক সময় সংলাপের মধ্য দিয়ে যা সম্ভব নয়, নাটকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে। বিবৃতি সর্বস্ব ঘটনা একটি সম্পূর্ণ নাটকীয় ঘটনায় পরিণত হয়েছে সঙ্গীত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

‘ভীষ্ম’ নাটকে ‘আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব’ গানটি নাটকের আনন্দরস ফুটিয়েছে, অপরদিকে ‘নীল আকাশের অসীম ছেয়ে’ গানটি একটি সূক্ষ্ম নাটকীয় তাৎপর্য ফুটিয়েছে। সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ‘মেবার পতন’, ‘সাজাহান’ এবং ‘চন্দ্রগুপ্ত’–এই তিনটি নাটক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ‘মেবার পতন’ নাটকের সঙ্গীতগুলি নাটকের সংঘাতকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিখ্যাত গান

‘মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট সৈন্য দুঃখে তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির’

সঙ্গীতটি মেবারের অতীত ইতিহাসের গরিমা বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়েছে। এভাবে সমগ্র নাটকটিতে একটি গতি সঞ্চারিত হয়েছে। নাটকের সর্বশেষ ও বিখ্যাত গান ‘আবার তোরা মানুষ হ’ বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে বড় করে তুলেছে। ‘সাজাহান’ নাটকে ‘আজি এসেছি’ একটি প্রেম সঙ্গীত। চারণী সঙ্গীত ‘যেথা গিয়াছেন তিনি’ একটি রণসঙ্গীত যা রাজপুত রমণীদের তেজস্বিতা প্রকাশ করেছে। চারণীরা গেয়েছেন ‘সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির’ যা একটি উদ্দীপনাময় মুহূর্তের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই

নাটকে দেশমাতৃকার বন্দনা সঙ্গীত 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেছে। 'আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে', 'আর কেন মিছে আশা', 'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই'ক সৈন্যদলের সমবেত সঙ্গীত 'যখন সঘন গগন গরজে' সার্থক নাট্যসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' ও 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' নাটকীয় পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছে। বাংলা নাটকে সঙ্গীত সংযোজনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশেষ অবদান। নাটকের প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে এই গুনগুলি আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানেই এদের বিশেষত্ব।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সুরের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাব সুরকার। সুরসৃষ্টির জন্য তাঁকে কোনও কষ্ট করতে হয়নি। অতি সহজে সাবলীলভাবে তিনি সুরসৃষ্টি করেছেন ও তাতে বাণীরূপ দিয়েছেন। হিন্দুস্থানী রাগরাগিনী ছিল তাঁর আয়ত্বের। সুরকার হিসেবে তিনি কীর্তন, বাউল, খেলায়, টপ্পা ও ধ্রুপদের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন কিন্তু কখনও ভুলেও হিন্দুস্থানী ওস্তাদির কণ্ঠ ও মল্লযুদ্ধের নকল করেননি। হিন্দুস্থানী রাগকে তিনি বাংলা গানের নিজস্ব আধারে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। অসাধারণ কয়েকটি গানের উল্লেখ না করলেই নয়, যেমন কীর্তন ঠাটে রচিত 'প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে', দেশ ঠাটে 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে', ভৈরবী ঠাটে 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে'। আমি এমনিই এসে ভেসে যাই' –এ গানের মধ্যে সুর এক আশ্চর্যরকম ছাড়া পেয়েছে। ভক্তির গানেও কবি এভাবে সুরকে ছাড়া দিতে পারতেন যেমন 'তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালোবাসি!' ভারতীয় রাগরাগিনীকে আশ্রয় করে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভঙ্গিটিকে তিনি অনায়াসে এবং অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিতে, যা এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। দেশভক্তিমূলক গানগুলির সুর বেশ সরল, কিন্তু এগুলির সুরের উত্থান পতনের সঞ্চালক খুব সহজ নয়। বিলিতি সুরে যাকে বলে movement দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে তার প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, কিন্তু উদ্দীপনা ও উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে, এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নূতন প্রাণ শক্তির সঞ্চার হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধেকে গানগুলি-এর যাথার্থ্য বহন করে। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর উক্তিটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য– 'দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্নচৈতন্যে, দেশি ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।' দেশাত্মবোধক গানগুলির সুর সংযোজনায় তিনি বিদেশি 'কোরাস' গানের সুরভঙ্গী ও গাইবার ঢং আমদানি করেছেন, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের অধিকাংশ সুরের মূলে আমাদের প্রথাগত রাগরাগিনীর আমেজ মিশে আছে। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটির ছন্দ, গায়ন প্রণালী, স্বরবিরাম ইত্যাদি ইউরোপীয় স্বরভঙ্গির কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ তা রচিত হয়েছ ভারতীয় সঙ্গীতের এক সুপরিচিত ঠটে যার নাম কেদারা। তেমনি 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' রচিত হয়েছে ভূপকল্যাণ ঠাটে, 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে' শীর্ষক সামরিক সঙ্গীতটি পাশ্চাত্য military সঙ্গীতের ঐতিহ্যের স্মারক, কিন্তু তার রাগ রূপটি হল কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত কেদারা রাগে। 'সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে' গানে 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির' গায়নে 'শির' শব্দটির স্বরস্থান এক লাফে চলে যায় মুদারার 'গা' থেকে তারার 'গা'– তে-ফুটে ওঠে বিদেশি সুরের উল্লম্ফন যা আমাদের সঙ্গীত সংস্কারে খুব অন্যরকম। এই দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা ও নিরীক্ষা বাংলা গানে একক ও অনুসরণীয়। পুত্র দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার কতগুলি গানের ইংরেজিতে অদূদিত রূপকে দ্বিজেন্দ্রলাল সংযোজিত সুরে গেয়েছেন। এখন ইউরোপীয়ান, আমেরিকানরাও অনায়াসে সেগুলি গাইতে পারেন। 'ধনধান্য পুষ্পভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের জার্মান, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত রূপকে বাংলা রূপের মূল সুরে গাওয়া সম্ভব হয়েছে, তার কারণ শুধু যে তাঁর গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশি গানের ঠাট ও ভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন তাই নয়– তার প্রাণশক্তিকেও পুরোপুরি আত্মসাৎ করার সহজ কৌশলটি আয়ত্ব করেছিলেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজীর সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিস্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।'